চোখ কি আসলেই এত নিখুঁত এবং জটিল?

বন্যা আহমেদ

এপ্রিল ১৮, ২০০৫

চোখ নিয়ে আমাদের কৌতুহলের শেষ নেই সেই অনাদিকাল থেকেই। কবিরা যেমন প্রিয়ার চোখের সৌন্দর্য্য নিয়ে হাজারো কবিতা লিখেছেন, গীতিকারেরা রচনা করেছেন হাজারো গানের পংক্তিমালা, তেমনি চোখের আপাত জটিলতায় দিশেহারা হয়ে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্ব ফেদেছেন সৃষ্টিতত্ত্ববাদীরা। আর ওদিকে জীববিজ্ঞানীরাও বহুদিন ধরেই চেষ্টা করে আসছেন বিবর্তন তত্ত্বের আলোকে চোখের সৃষ্টি এবং গঠনকে ব্যাখ্যা করার। গত কয়েক দশকে বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে এক অভাবনীয় গতিতে - পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা কিংবা অনুজীবতত্ত্বের বিভিন্ন অভুতপূর্ব আবিষ্কার থেকে শুরু করে মানুষের ডি এন এর (Human Genome sequecing) পর্যন্ত পাঠোদ্ধার করে ফেলা হয়েছে। আর বিজ্ঞান যতই এগিয়ে যাচ্ছে ততই আমরা বুঝতে পারছি চোখকে আমরা যত নিখুঁত এবং জটিল বলে মনে করি আসলে তা আদৌ সেরকম নয়।

ইদানিংকালে আইডি-ওয়ালারা (Intelligent Design এর প্রবক্তারা) আবার নতুন করে চোখের গঠন নিয়ে অনেক হইচই শুরু করছেন, তাদের মতে আমাদের চোখের গঠন এত জটিল, সুক্ষ্ম এবং নিখুত যে বুদ্ধিমান কোন স্রষ্টার ডিজাইন ছাড়া তা সৃষ্টিই হতে পারে না। ৫%, ১০%, সিকিভাগ বা অর্ধেক চোখ নাকি জীবের কোন কাজে আসতে পারে না। ডঃ রিচার্ড ডকিনস, ডঃ কেনেথ মিলার সহ অনেক বিজ্ঞানী ইতিমধ্যেই তাদের এই দাবিগুলোকে ভুল বলে প্রমাণিত করেছেন। বিজ্ঞানীরা চোখ সম্পর্কে কি মনে তা বলার আগে এই আইডি এবং বিবর্তনবাদ প্রসংগে বোধ হয় দুই একটি কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন। সাধারণ পাঠকের কথা মনে রেখে আমি এ প্রসঙ্গে খুব বেশী তাত্ত্বিক বা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় যেতে চাইছিনা, আর তাছাড়া ভোরের কাগজের গত কয়েকটি সংখ্যায় আইডি নিয়ে কিছু চমৎকার লেখা প্রকাশিত হয়েছে, আগ্রহী পাঠকেরা নিশ্চয়ই ইতমধ্যেই তা পড়ে ফেলেছেন। এ ছাড়াও এ বিষয়ে আরেকটু বিষদভাবে জানতে হলে বাঙ্গালী যুক্তিবাদী এবং ফ্রিথিঙ্গারদের সাইট 'মুক্ত-মনা' (www.mukto-mona.com) ঘুরে আসতে পারেন। ওখানে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'-এর যুক্তি খন্ডন করা বেশ কিছু ভাল প্রবন্ধ রাখা আছে।

৯০ দশক থেকেই মাইকেল বিহে, উইলিয়াম ডেম্বস্কি সহ বেশ কয়েকজন আইডি বা Intelligent Design মতবাদটিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বলে চালাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। ইদানিংকালে আইডি নিয়ে অনেকই হইচই হচ্ছে এবং আইডি- ওয়ালারা আমেরিকার বিভিন্ন রক্ষনশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সমর্থন পেয়ে এতই শক্তিশালী হয়ে উঠছে যে এখন তারা দাবি করতে শুরু করেছে যে আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকে একে বিবর্তনবাদের বিকল্প বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিসেবে যোগ করতে হবে। ভাবলেও অবাক লাগে একবিংশ শতাব্দীতে বসে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে কিভাবে বিজ্ঞানের পরিবর্তে ধর্মীয় মৌলবাদকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। তাহলে অতি পুরনো সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে আপাতদৃষ্টিতে দেখতে ঝকঝকে নতুন এই মতবাদের পার্থক্যটা কি? 'জীবের গঠন এত জটিল, নিখুত এবং সুক্ষ্ম যে এর পিছনে কোন সচেতন এবং বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত থাকতেই হবে'- সৃষ্টিতত্ত্বের সেই পুরানো যুক্তিটিকে আধুনিকতার মোড়কে পুরে নতুন নামে চালানোর প্রচেষ্টা ছাড়া আইডি আর কিছুই নয়। বিজ্ঞান এখন এতই এগিয়ে গেছে যে কোন

নির্বোধের পক্ষেও আজকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে পৃথিবী আসলে বাইবেলে বর্ণিত সময় ৬০০০ বছর আগে সৃষ্টি হয়নি বা আমাদের চারপাশে বিবর্তনের ভুড়িভুড়ি উদাহরণ দেখা যায় না। তাই আইডি-ওয়ালারা সাধারন মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য আর এক নতুন উপায় খুজে বের করেছেন। তারা এখন বলছেন, আমাদের এই পৃথিবী আসলেই বাইবেলে উল্লেখিত ছয় হাজার বছরের চেয়ে অনেক বেশী পুরনো এবং আমাদের চারপাশের জীবের মধ্যে ছোট ছোট বিবর্তনও ঘটছে ঠিকই, কিন্তু আদিতে সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে কোন এক বুদ্ধিমান সত্ত্বার মাধ্যমে। আমাদের চারপাশের জৈব-রাসায়নিক সিস্টেমগুলো এতই সুক্ষ্ম এবং জটিল যে তাদের পক্ষে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। যে কোন একটি জটিল অংগের প্রত্যেকটি অংশ একে অন্যের উপর এতটাই নির্ভরশীল যে তারা পুর্নাংগ রূপ ধারণ না করা পর্যন্ত কোন কাজেই আসতে পারে না।

চার্লস ডারউইন এবং অ্যলফ্রেড ওয়ালেস বিবর্তনবাদের ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন আজকে থেকে প্রায় দেড়শ বছর আগে। তিনি তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বে বিভিন্ন পর্যবেক্ষন থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে, প্রকৃতিতে সবসময় খাদ্য, বেচে থাকা, জায়গা, সঙ্গী নির্ধারণ, আশ্রয়, এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে একধরনের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। প্রকৃতি উপযুক্তদের টিকিয়ে রাখে, আর অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্তরা ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়। ডারউইন প্রকৃতির এই বিশেষ নির্বাচন প্রক্রিয়াটারই নাম দেন প্রাকৃতিক নির্বাচন বা Natural Selection এই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলশ্রুতিতেই যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে তাকেই বলা হয় বিবর্তন । বিবর্তনবাদকে এখন চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান এবং অনুজীববিদ্যাসহ জীববিদ্যার আন্যান্য বিভিন্ন শাখার ‘তাত্ত্বিক ভিত্তিমুল’ হিসেবে গন্য করা হয়।

বিবর্তনবাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলেই দেখা যায় যে, উপরে উল্লেখ করা আইডি-ওয়ালাদের সবকটি যুক্তিই ভুল। প্রথমতঃ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে অত্যন্ত জটিল অংগ-প্রত্যংগ গড়ে ওঠা যে সম্ভব তা ইতমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আংশিকভাবে চোখের উৎপত্তি ও বিকাশ যে সম্ভব এবং তা যে একটি জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তারও অজস্র উদাহরন রয়েছে আমাদের চারপাশে। এবং তৃতীয়তঃ মানুষের চোখকে যেভাবে তারা একটি নিখুঁত, অনন্য সৃষ্টি বলে দাবী করছেন তাও নিতান্তই একটি ভুল ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রত্যেক জেনারেশনে নতুন করে শুন্য থেকে তার কাজ শুরু করে না, মিউটেশনের (Mutation, বংশ গতির একক বা জীনের মধ্যে আকস্মিকভাবে ঘটা পরিবর্তনকে মিউটেশন বা পরিব্যাপ্তি বলে। এর ফলে জীবের ডি এন এর গঠন বা সংখ্যায় পরিবর্তন ঘটে) মাধ্যমে ঘটা অনুকুল পরিবৃত্তিগুলোকে সে বংশপরম্পরায় জিইয়ে রাখে আর যে পরিবৃত্তিগুলো পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেনা সেগুলোকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ করে দেয়। এই মিউটেশনগুলো জীবের নিজস্ব প্রয়োজনে বা ইচ্ছায় ঘটে না, সুপরিকল্পিতভাবেও ঘটে না, হঠাৎ করেই ঘটে। একটা অনুকুল মিউটেশন ঘটার আগে বা পরে হয়তো হাজারটা মিউটেশন ঘটে যায় যেগুলো প্রকৃতিতে টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। আর একটার পর আরেকটা অনুকুল মিউটেশন থেকে ক্রমান্বয়ে আরও জটিল জীব অথবা অংগপ্রত্যংগ সৃষ্টি হয়। বিবর্তন ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা একটি প্রক্রিয়া, এটি কোন পুর্বনির্ধারিতভাবে সাজানো ডিজাইন প্রক্রিয়া নয়।

বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন হাজার হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে ঘটে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাংগ গঠন দেখে মুগ্ধ হই তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি, তা বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। বিবর্তনের ইতিহাসে, খুব সম্ভবত, বেশ কয়েকবারই

আলাদা আলাদাভাবে চোখের বিকাশ ঘটেছে- মাকরসা, কাকড়া, বিভিন্ন পোকার মত সন্ধিবদ্ধ (arthropod) প্রানীদের মধ্যে, আবার অকটোপাস, শামুক, ঝিনুক জাতীয় মলাস্ক (Mollusk) প্রাণীদের মধ্যে এবং মেরুদন্ডী (Vertebrates) প্রাণীদের মধ্যে। এই তিনটি গ্রুপের মধ্যেই আলাদা আলাদাভাবে চোখের সৃষ্টি এবং বিকাশ ঘটেছে - এই বিভিন্ন ধরনের চোখগুলো একেটা একেক রকম পদ্ধতিতে কাজ করলেও শেষ পর্যন্ত এরা সবাই চোখের ভুমিকাই পালন করে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল একধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের বিকাশ শুরু হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে তারা এই রূপ গ্রহন করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মত অবতলে যদি ঠিকমতভাবে সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি-চোখের সৃষ্টি হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্নয় করা সম্ভব হয়ে উঠে। এখন যদি এই কাপটির ধারগুলোকে কোনভাবে বন্ধ করা যায় তাহলে আধুনিক pin-hole camera র মত চোখের উৎপত্তি ঘটবে। তারপর একসময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট (Retina) বা রং বুঝতে পারে কোনের (cone) মত এমন একটি অংশ বিকাশ লাভ করে তাহলে আরও উন্নত একটি চোখের সৃষ্টি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে Iris diaphramer উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভিতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের(lens) উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহযোগীতা করবে আর এর ফলে চোখের উপযোগীতা আরও বাড়বে। এইভাবেই সময়ের সাথে সাথে মিউটেশনের মাধ্যমে চোখের ক্রমান্বয়িক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, কিছু আদিম প্রানীর মধ্যে এখনও আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়। কিছু এক কোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে নামমাত্র ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলি একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরার মত মেরুদন্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে, এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

অনেকেই মনে করেন যে চোখের (কিংবা কান, পাখা, ফুসফুস ইত্যাদি) মত একটি গুরুত্বপুর্ন অংশ ধীরে ধীরে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি হতে পারে না, কারণ মধ্যবর্তী পর্যায়গুলো স্বতন্ত্রভাবে ঠিকমত কাজ করতে পারবে না, এবং তার ফলে তাদের কোন উপযোগীতাই থাকতে পারে না। তারা আসলে এখানে বিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপুর্ন দিকটিই বুঝতে পারেন না বা এড়িয়ে যেতে চান। জীবের কোন অংশকে প্রাকৃতিক নির্বাচনের দৃষ্টিকোন থেকে সুবিধাজনক অবস্থানে আসার জন্য পুর্নাংগভাবে বিকাশিত হতে হয় না। অন্ধ হওয়ার থেকে আংশিক দৃষ্টিশক্তি থাকা অনেক ভালো। আমাদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টিক্ষীনতার (myopia) বা দুরের বা কাছের দৃষ্টিহীনতার সমস্যা আছে, তার ফলে আমরা দুরে বা কাছে অস্পষ্ট দেখি। কিন্তু আমরা যদি আদিম কালের মত বন্য জীবন যাপন করতাম এই সীমাবদ্ধতাসহ চোখই আমাদেরকে অনেকখানি সুবিধা এনে দিতে পারতো। আমরা খাওয়া, আশ্রয়, সঙ্গী, বা শিকারী পশুদের দেখতে পেতাম, তাদের নড়াচড়া বুঝতে পারতাম। যে জনসমষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টিশক্তিই নেই বা খুবই সীমিত দৃষ্টিশক্তি আছে তাদের জন্য চোখের উদ্ভব বা চোখের মত যে কোন অঙ্গের বিন্দুমাত্র উন্নতিই অনেক বাড়তি সুবিধা এনে দেবে। একেবারেই দর্শনশক্তি না থাকা মানে হচ্ছে সে পুরোপুরিই অন্ধ, এখন প্রানীটির মধ্যে যদি অর্ধেক বা সিকিভাগ দৃষ্টিক্ষমতাও বিকাশ লাভ করে তাহলেই সে কিছু হলেও তার শিকারীর গতিবিধি দেখতে পাবে বা বুঝতে পারবে। চোখের এইটুকু আংশিক বিকাশই প্রাণিটির বেচে থাকা বা না থাকার মধ্যে বিশাল একটি ভুমিকা রাখতে পারে। একই যুক্তি খাটে পাখার ক্ষেত্রেও, আমরা

চারপাশে আংশিক পাখাসহ প্রচুর প্রানী দেখতে পাই। টিকটিকি, ব্যঙ্গ, শামুক জাতীয় গ্লাইড করে চলে এমন অনেক প্রানীর মধ্যেও আংশিক পাখার মত অংশ দেখতে পাওয়া যায়। গাছে থাকে এমন অনেক প্রানীর দুই জয়েন্টের মাঝখানে পাখার মত একধরনের চামড়ার অস্তিত্ব দেখা যায় যেটা আংশিকভাবে বিকশিত পাখা বৈ আর কিছু নয়। পাখাটি কত ছোট বা বড় তা এখানে ব্যাপার নয়, প্রাণীটি যদি কখনও গাছ থেকে পড়ে যায় তাহলে ওইটুকু পাখা ব্যবহার করেই সে তার জীবন বাচাতে পারবে যা কিনা তাকে টিকে থাকতে বাড়তি সুবিধা জোগাবে।

আইডি প্রবক্তাদের আরেকটি অতিপ্রিয় উদাহরণ হচ্ছে চোখের নিখুঁত গঠন যা তাদের মতে কোন বুদ্ধিদীপ্ত সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ ছাড়া সৃষ্টিই হতে পারে না। আর অন্যদিকে বিজ্ঞানীরা বলেন, বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচন যেহেতু শুধুমাত্র বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আরও উন্নততর রূপে পরিনত হয়, তাই খুব যুক্তিসঙ্গত কারণেই প্রাণীর মধ্যে অনেক ত্রুটিপূর্ণ অংগপ্রত্যংগ দেখা যায়। এ প্রেক্ষিতে এখন দেখা যাক আইডি-ওয়ালারা যেমনটি দাবী করছেন, মানুষের চোখ আসলেই সেরকম ত্রুটিহীন বা নিখুঁত কিনা। চোখের অক্ষিপটের (Retina) ভিতরে একধরনের আলো-গ্রহনকারী (Photoreceptor or photo cells) কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহন করে এবং তারপর একগুচ্ছ দর্শন স্নায়ুর (Optic nerve or ganglion cells) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌছানোর ব্যবস্থা করে, যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই। কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই জালের মত করে ছড়িয়ে থাকা এই স্নায়ুগুলোকে আলো গ্রহনকারী কোষগুলোর সামনের দিকে বসিয়ে দেবেন না! কারণ তাহলে তো বেশ কিছু আলো বাধা পাবে, আমরা এই বাধাটুকু না থাকলে যতখানি দেখতে পেতাম তার থেকে কম দেখতে পাবো এবং এর ফলে আমাদের দৃষ্টির মান অনেক কমে যাবে! কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবেই আমাদের চোখ ওরকম। আমাদের আক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মত ছড়ানো থাকে, শুধু তাই না, এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে, এর ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টশক্তির মান কিছুটা হলেও কমে যায়।

স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারনে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে । এই স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌছানোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নেয়। এর ফলে একটি অন্ধবিন্দু বা blind spot এর সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রত্যেকের চোখেই এক মিলিমিটারের মত জায়গা জুড়ে এই blind spot টি রয়েছে, আমরা আপাতভাবে বুঝতে না পারলেও ওই জায়গাটিতে আসলে আমাদের দৃষ্টি সাদা হয়ে যায়। পাঠকেরা ইচ্ছা করলে নীচের ওয়েব সাইটিতে যেয়ে চোখের blind spot টি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। http://serendip.brynmawr.edu/bb/blindspot1.html

তাহলে কি চোখ সৃষ্টির সময় এই সীমাবদ্ধতাগুলো মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় খোলা ছিলো না? তাও তো ঠিক নয়! আমাদের সামনেই এরকম প্রানীরও উদাহরণ তো রয়েছে যাদের স্নায়ুগুলো খুব নিখুতভাবে আলো-গ্রহনকারী কোষগুলোর পিছনে বসানো আছে! স্কুইড এবং অকটোপাসেরও আমাদের মতই একধরনের লেন্স-এবং-অক্ষিপটসহ চোখ আছে, যার প্রয়োজনীয় স্নায়ুগুলো অক্ষিপটের পিছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোন blind spot এর সৃষ্টি হয়নি। আসলে বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে আমাদের চোখের এই সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিকে কে খুব সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। বিবর্তন কাজ করে শুধুমাত্র ইতিমধ্যে তৈরী বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে নতুন করে কিছু সৃষ্টি বা বদল করতে পারে না। মেরদন্ডী প্রানীর চোখের সৃষ্টি হয়েছে মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে

পরিবর্তন করে যা অনেক আগেই সৃষ্টি হয়েছিলো, বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের এই অংশটি পরিবর্তিত হতে হতে আলোর প্রতি সংবেদনশীলতা লাভ করেছে। মস্তিষ্কের এই সংবেদনশীল কোষগুলো অক্ষিপটের আকার ধারণ করলেও মস্তিষ্কের পুরোনো মূল গঠনটি তো আর বদলে যেতে পারেনি, তার ফলে এই জালের মত ছড়িয়ে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে মলাঙ্ক (স্কুইড বা অকটোপাস) জাতীয় প্রানীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। মস্তিষ্কের মত ত্বকের স্নায়ুগুলো ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভিতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো মলাঙ্কের চোখের অক্ষিপটের সামনে না থেকে পিছনেই রয়ে গেছে। আমাদের চোখ যদি এভাবে লাখ লাখ বছর ধরে প্রাকৃতিকভাবে বিবর্তিত না হয়ে কোন পূর্বপরিকল্পিত ডিজাইন থেকে তৈরী হত তাহলে হয়তো চোখের এত সীমাবদ্ধতা নিয়ে বিজ্ঞানীদেরও আর মাথা ঘামাতে হত না।

বন্যা আহমেদ
আটলান্টা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে
bonna_ga@yahoo.com